তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদক মালাধর বসু ও অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয়

প্রাচীন বাংলা কাব্য-কবিতা পাঠ করলে দেখা যায় যে, কবিরা কাব্যের 'ভণিতা' অংশে নিজের নাম, পরিচয় বলে গেছেন। তাই কবির পরিচয় দিতে গেলে প্রথম নজর পড়ে ভণিতার দিকেই। অনেক সময় দেখা যায় ভণিতায় নাম থাকলেও তা নিয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। ভণিতায় যে নাম আছে, তা কবির নিজের নাম না অন্য কারও নাম এই সংশয়ও অনেক সময় থেকে যায়। আসলে দেখা যায়, প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্যে অনেক অপ্রধান কবি প্রতিভাধর কবিদের নামে নিজের রচনা চালিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় উপাধি বা শিরোপা পাওয়া নাম নিয়েও সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় উপাধি প্রাপ্তির দিক থেকে বিচার করেও কাব্য রচনার সন, তারিখ নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। এর কারণ মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কবিই 'হেঁয়ালি'র মাধ্যমে তাঁদের কাব্য রচনার কথা জানাতেন এবং সেই হেঁয়ালির মধ্যেও ভুলভ্রান্তি থেকেই যেত।

আমরা জানি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর রাজা গণেশের সময়ে কিছুকালের জন্য স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজত্ব ব্যতীত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী গৌড়ের ইতিহাসে নিরঙ্কুশ মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে মুসলমান সুলতানদের রাজসভায় তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য পাওয়া যায়নি। বলা যায় যে, তুর্কি আক্রমণের পর কয়েক শতাব্দী শাসনকার্যে স্থিতাবস্থা লাভ করতেই কেটে যায়। গৌড়ের অধিকাংশ পাঠান সুলতান বীর্যবত্তার যতখানি পরিচয় দিয়েছিলেন ততখানি বিদ্যোৎসাহী বা সাহিত্যানুরাগী ছিলেন না। অনেকে মনে করেন যে, গৌড়ের অধিকাংশ সুলতান সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁরা কবিদের রাজসভায় সমাদর করতেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, রাজসভায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও গুণী সমাদর প্রথম লক্ষ করা গেল সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলে। বাংলায় ইসলামি শাসন কায়েম হলে অনেক পাঠান-সুলতান কবি পণ্ডিতদের থেকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের গল্প শুনতে আগ্রহী হন। অনুবাদ রচনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ছুটি খাঁ তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়ে নেন। সাহিত্য-অনুবাদের এই ধারার মাধ্যমে সমাজে

অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের ছবিই ফুটে ওঠে। সমাজ-সংস্কৃতির পুনর্গঠনে এই ঔদার্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

প্রাক্ চৈতন্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম রাজন্য-পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ করতে দেখা গিয়েছিল এদেশের বাঙালি কবিদের। আমরা জানি গৌড়েশ্বরের কাছে শ্লোক পাঠ করে কৃত্তিবাস ওঝা ফুলের মালা ও পট্টবস্ত্র উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন। মালাধর বসুও যে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কাব্য বাংলায় অনুবাদ করার জন্য প্রশংসনীয় 'গুণরাজ খান' উপাধিলাভ করেছিলেন, তিনি সম্ভবত রুকনুদ্দীন বারবক শাহ। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি মালাধরের পরিচয় দিতে গিয়ে রুকনুদ্দিন বরবকশাহের কথা বলেছিলেন —

> "রুকনুদ্দিন বরবকশাহ্ ১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কবি এই অনুবাদকাব্য রচনা শুরু করেন ১৩৯৫ শকে, অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীঃ অব্দে। তাই মনে হচ্ছে রুকনুদ্দিনই কবিকে এই উপাধি দিয়েছিলেন।"[১]

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য পাঠ করলে কবির নিজের দেওয়া ভণিতা পাওয়া যায়। যে কোনো প্রাচীন কাব্য আলোচনায় এবং কবির পরিচয় নিরূপণে ভণিতার মূল্য অপরিসীম। তাই এই কাব্যের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত ভণিতাগুলির মূল্যও অনেকটাই। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে প্রাপ্ত ভণিতাগুলির মধ্যে কবির 'গুণরাজ খান' নামটিই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। এর বাইরে অল্প কিছু স্থানে মালাধর বসু নামাঙ্কিত ভণিতাও আমরা পেয়েছি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের প্রথম দিকে মালাধর বসু যে আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ --

"বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুণ্য হইতে মোর নারায়নে মতি।।
জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।
গুনরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।।"[২]

এই পংক্তি থেকে বোঝা যায় কবির পিতার নাম ভগীরথ আর মায়ের নাম ইন্দুমতি। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পিতা-মাতার পুণ্যফলেই কবির অন্তরে কৃষ্ণভক্তি জাগরূক হয় এবং তিনি এই কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁর সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের ভূমিকা অংশে মালাধর বসুর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি হল-- "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস"[৩] এবং উক্ত শ্লোকের পৃষ্ঠা সংখ্যা তিনি দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২-পৃঃ। কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের সংস্করণ এবং ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের সংস্করণ দুটি সংস্করণই আমরা দেখেছি, সেখানে উক্ত পৃষ্ঠায় এই শ্লোকটি নেই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কেন এইরূপ নিদর্শন দিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করলেন? তাহলে কি তিনি অন্য কোথাও এইরূপ নিদর্শন দেখেছিলেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে কোথায় দেখেছিলেন? এই বিষয়ে বলতে হয় ১৮৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও রাধিকানাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর একটি সংস্করণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে নন্দলাল বিদ্যাসাগর উক্ত গ্রন্থটিকে অবলম্বন করেই 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রকাশিত করেন। সেই সম্পাদিত গ্রন্থে শেষের কয়েকটি পংক্তিতে কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য আছে। যদিও আমরা সেই সংস্করণটি হাতে পাইনি। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে আমরা সেই পংক্তিগুলি পেয়েছি। সেই পঙক্তিগুলি হল—

"গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম 'গুণরাজ খান'।।
সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধু জন।।
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞি।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে, ক্ষমা-ভিক্ষা চাই।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে 'হরি' বল সর্ব্বজন।।"[৪]

আমাদের অনুমান খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থের অবলম্বিত পুথি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি সম্ভবত সেই পুথির পাঠ থেকেই উক্ত পংক্তি গ্রহণ করেছিলেন। নয়তো তাঁর মত অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে এমন ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত ছত্রে দেখা যায় কবি লিখেছেন-- তাঁর কোন গুণ নেই, জ্ঞানও নেই এবং তিনি অধম। তিনি আরও লিখেছেন যে, গৌড়েশ্বর তাঁকে নাম দিয়েছিল 'গুণরাজ খান'। কিন্তু এই গৌড়েশ্বর কে ? --তাঁর সম্পর্কে কবি কিছুই বলেন নি। এমনকি, তাঁর নামও তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কাব্যপাঠে দেখা যায় গৌড়েশ্বর প্রদত্ত নামটিই তিনি ব্যবহার করেছেন বেশি; তুলনায় মালাধর বসু নাম খুব কম পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে বলেছেন—

> "গৌড়েশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃই হউক, বা খেতাবের মোহের প্রভাবেই হউক, কবি তাঁহার পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা রাজদত্ত নামেই পরিচিত হইতে বেশী ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"[৫]

জানা যায় যে, সে সময় রাজা ও সুলতানদের মত দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও সাহিত্য ও শাস্ত্র-চর্চার পোষকতা করতেন। এঁরা কবি-পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা যেমন ছিলেন, তেমনি নিজেরাও সুযোগ ও যোগ্যতা মত কাব্য রচনা করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষের দিকে এক রাজকর্মচারী কবি গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু। ইনি সম্ভবত সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন এই কথা আগেও বলা হয়েছে। কিন্তু 'মধ্যযুগে বাঙালী' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গৌড়েশ্বরকে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বলে মনে করেছেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, ১৮৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার শেষ দিকের একটি পদে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল সংক্রান্ত একটি পদ আছে। সেই পদটি হল—

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"[৬]

পদটি থেকে জানা যায় যে, ১৩৯৫ শক অর্থাৎ ১৪৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা শুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা শেষ হয়। আর আলাউদ্দীন

হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহলে বলা যায়, হোসেন শাহ্ মালাধরের পৃষ্ঠপোষক নন। তাঁর পূর্বে যে সকল গৌড়েশ্বর রাজত্ব করেন তাঁদের একটি কালপরিচয় জ্ঞাপক তথ্য ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় দিয়েছিলেন তাঁর 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর' নামক গ্রন্থে। সেটি নিম্নে প্রদত্ত হল—

নাম	শাসনকাল
১) নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ (১ম)	আনুমানিক ৮৩৯-৮৬৪ হিজিরা/আনুমানিক ১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ
২) রুকনুদ্দীন বার্‌বক শাহ (মামুদ শাহের পুত্র)	৮৬০-৮৮০ হিজিরা/১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ
৩) শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (বার্‌বক শাহের পুত্র)	৮৭৯-৮৮৫ হিজিরা/১৪৭৪-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ
৪) সিকন্দর শাহ (ইউসুফ শাহের পুত্র?)	৮৮৫-৮৮৬ হিজিরা/১৪৮০-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ
৫) জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ (মামুদ শাহের পুত্র)	৮৮৬-৮৯২ হিজিরা/১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ

মামুদশাহী বংশের শাসনকাল সমাপ্ত হবার পর বাংলার শাসন ক্ষমতা যায় সুলতান শাহজাদা ও হাবশী সুলতানগণের হাতে। তার একটি তালিকাও উক্ত গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। তালিকাটি নিম্নরূপ—

নাম	শাসনকাল
১) সুলতান শাহজাদা	৮৯২হিজিরা/১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ
২) সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবশী)	৮৯২-৮৯৫হিজিরা/১৪৮৭-১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ
৩) নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ(দ্বিতীয়) (হাবশী ফিরোজ শাহের পুত্র)	৮৯৫-৮৯৬ হিজিরা/১৪৯০-১৪৯১ খ্রিস্টাব্দ

৪) শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (হাবশী) ৮৯৬-৮৯৮ হিজিরা/১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ

উক্ত সুলতানগণের রাজত্ব সমাপ্ত হবার পরেই হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ শাসন ক্ষমতায় আসেন। যেখানে প্রথম সুলতান হিসেবে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকাল শুরু হয় ৮৯৮-৯২৫ হিজিরা অর্থাৎ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে। তাহলে ওপরে উল্লেখিত কাব্যের রচনাকালকে প্রামাণিক হিসেবে ধরে নিলেও দেখা যাচ্ছে যে, এই কাব্যের রচনা হোসেন শাহের সিংহাসন আরোহণের অনেকটা আগেই হয়েছিল। সুতরাং হোসেন শাহ মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না।

আবার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে শামসুদ্দীন ইউসুফ্ শাহ্ মালাধরকে 'গুনরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য—

> "মালাধর বসু গৌড়েশ্বর শমসুদ্দিন ইউসুফ্ শাহ্ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন.....। সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। 'পুরন্দর খাঁ', ''গুণরাজ খাঁ' এই সমস্ত রাজদত্ত খেতাব।"[৭]

এই অনুমান যারা সমর্থন করেছেন তাঁদের যুক্তি হল কাব্য রচনাকালেই কবির উপাধি প্রাপ্তি ঘটতে পারে। মালাধর যখন এই কাব্য লিখেছিলেন তখন তাঁর কবিত্ব খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে এবং গৌড়েশ্বর তাঁকে উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বলতে হয়— 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য লেখার আরম্ভই যখন ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তখন মালাধর তার বেশ কিছুকাল আগেই এই উপাধি প্রাপ্ত হন। কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, কাব্যের শুরু থেকেই 'গুণরাজ খান' নামাঙ্কিত ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব ইউসুফ্ শাহ্ নয়, সময়ের হিসেব ধরলে বলা যায় যে বারবক শাহই মালাধরের পৃষ্ঠপোষক।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ এবং মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ প্রসঙ্গে তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে একটি ভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। সেই মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা হল—

> "..... মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার দিনে বহু দেববাদী পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ একেশ্বরবাদী মুসলমানের কাছে আদরণীয় হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহার উপর বিধর্মী সুলতান হিন্দুর কাব্য নহে, নাটক নহে, এমনকি স্মৃতি-শাস্ত্র বা চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে, একেবারে তাহার ধর্ম গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন ইহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক। ভুলিলে চলিবে না পাঠান বিজয়ের বহু পরে মোঘল

আমলে যখন হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি দেখা গিয়াছিল এবং হিন্দু রাজকুমারীরা মোঘল হারেমে পত্নীত্বের অধিকার পাইয়াছিল, সেই কালেও হিন্দুর উদারতম ধর্মশাস্ত্র উপনিষদকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করার অপরাধে সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাশিকোহ মুসলমান সমাজে 'কাফের' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং 'কাফের' হওয়ার অজুহাতেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে গোঁড়া পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ অথবা অন্য কোন সুলতান মালাধর ও কৃত্তিবাসকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া কবিদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক যদি প্রকৃত সুলতান হইতেন, তাহা হইলে মালাধরের ভাগ্যে কেবল একটি সামান্য উপাধি (গুণরাজ খান) ও কৃত্তিবাসের ভাগ্যে একটি পাটের পাছড়া (উত্তরীয়) মাত্র জুটিত না। খেতাবের সহিত প্রচুর ভূসম্পত্তিও লাভ হইত এবং তবেই সুলতানী মর্যাদা রক্ষা পাইত। কবিদ্বয় কোন হিন্দু জমিদারের উৎসাহ পাইয়াছিলেন, ইহা হওয়াই সম্ভব। তবে ভারতবর্ষ অতিশয়োক্তির দেশ, এ দেশের কবির কল্পনায় ভূম্যধিকারিমাত্রই 'আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ'। এরূপ ক্ষেত্রে উৎসাহদাতা গ্রাম্য জমিদারও যে গৌড়েশ্বর রূপে বর্ণিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি। উৎসাহদাতা গৌড়েশ্বরের নাম সর্বসাধারনের কাছে উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই কবিদ্বয় উহা প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।"[৮]

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, তাঁর এই ধারণা নিতান্তই অমূলক। কারণ বিভিন্ন শিলালিপি থেকে পাওয়া প্রমাণের সূত্র ধরে বলা যায়, বারবক শাহ নিজে ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত এবং শিলালিপিগুলিতে তাঁর নামের সঙ্গে দুটি উপাধিও পাওয়া যায়-- একটি 'অল্ ফাজিল' এবং অন্যটি 'অল্ কামিল'। উপাধি দুটির অর্থ উচ্চস্তরের পাণ্ডিত্যগুণের অধিকারী। বারবক শাহ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি এতটাই উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন যে, রাজকর্মচারী নিয়োগের মত সভাসদ নির্বাচনেও তাঁর কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। 'শরফনামা' রচয়িতা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যেমন সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন তেমনি নরহরি বিশারদ, রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতগণও তাঁর রাজসভায় স্থানলাভ করেছিলেন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে আর একটি তথ্য পাওয়া যায়। সেটি হল-- কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনিতে 'গন্ধর্ব খাঁ' ও 'গন্ধর্ব রায়' নামে আরও দুজনের

পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। গন্ধর্ব রায়ের প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ গোবিন্দ বসু, আর গন্ধর্ব খাঁ সম্ভবত গোপীনাথ বসু। এই দুই সহোদর সুলতানের প্রিয়পাত্র হবার ফলে ধনাধ্যক্ষ ও রাজস্ববিভাগের মন্ত্রী হয়ে উক্ত নামে পরিচিত হন। জানা যায় যে, এঁরা ছিলেন আবার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা। গন্ধর্ব রায় ও গন্ধর্ব খাঁ যদি সুলতান বারবক শাহের অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন তাহলে মালাধর বসুও একই সুলতানের অনুগৃহীত হওয়া সম্ভব। কারণ মালাধর বসুর প্রাপ্ত উপাধি ''গুণরাজ খাঁ' বা ''গুণরাজ খান'। আবার জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে কবিকে 'গুণরাজ ছত্রী' রূপে উল্লেখ করেছেন—

''গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়

নানা মহোৎসব করি।

দেখিঞা প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস

রহাইল চরণে ধরি।।''[৯]

এই 'ছত্রী' পদটি ঠিক কোন ধরনের পদ তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

কবি মালাধর তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন -- 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস', কিন্তু এই বিষয়ে হলফ করে বলা যায় না যে, মালাধরের জন্মস্থান কুলীন গ্রাম, নাকি তিনি কুলীন গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রাম নামে একটি গ্রাম এখনও বর্তমান আছে। চৈতন্যদেব রামানন্দ বসুকে উদ্দেশ্য করে মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর যে প্রশংসা করেছিলেন সেখানে কুলীনগ্রামের বিশেষ কথা আছে, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কবি কৃষ্ণদাস জানিয়েছেন --

''কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।

প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া।।

গুণরাজখান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।

এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।।

তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।

সেহ মোর প্রিয়-- অন্যজন রহু দূর।।"[১০]

জানা যায় যে, চৈতন্যের সমকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম চর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে কুলীনগ্রামের বিশেষ খ্যাতি হয়েছিল। দীনেশ্চন্দ্র সেন জানিয়েছেন—

> "কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রীগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি' প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ তীর্থে যাইতে পারিতেন না।"[১১]

এই সময় সত্যরাজ খান ও রামানন্দের নেতৃত্বে কুলীনগ্রামে একটি কীর্তনের দল তৈরি হয়। নীলাচলে রথযাত্রার সময় এই কীর্তনীয়া সম্প্রদায় মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে আছে—

"কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।

তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।।"[১২]

এই কুলীনগ্রাম থেকে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় অনেকে মহাপ্রভুকে নীলাচলে গিয়ে দর্শন করে আসতেন। কথিত আছে যে, একবার 'পাণ্ডুবিজয়' উৎসবে জগন্নাথ দেবের রথের দড়ি কোনভাবে ছিঁড়ে গেলে সেই দড়ি তৈরি করে আনবার দায়িত্ব চৈতন্যদেব সত্যরাজ ও রামানন্দকে দিয়েছিলেন। কুলীনগ্রামের বসু বংশের তৈরি করা সেই পট্টডোরী নীলাচলে পৌঁছোলে রথযাত্রায় জগন্নাথদেবের 'শেষ অধিষ্ঠান' সম্পন্ন হত। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে বলা আছে--

"কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।

তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান--।।

এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।

প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ।।

এত বলি দিলা তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।

ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি।।

এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান--।

দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান।।"[১৩]

কুলীন গ্রামের বসু-বংশ আজও এই সম্মান ভোগ করে চলেছেন। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় এই বংশের পট্টডোরী নীলাচলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বসু বংশের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে, এই বসু বংশ মাহীনগর সমাজভুক্ত কুলীন কায়স্থ ছিল।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের 'কায়স্থ সমাজ' পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ মহাশয় 'কবি গুণরাজ খাঁ বংশ' প্রবন্ধে মালাধর বসুর একটি বংশ-তালিকা প্রদান করেছিলেন। আমরা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ থেকে উক্ত বংশ-তালিকাটি নিম্নে তুলে ধরছি। এই বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেছিলেন —

> "কুলীনগ্রামের বসু-বংশের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। এই বসু-বংশ মাহীনগর-সমাজভুক্ত ছিলেন। কুলজির প্রমাণ অনুসারে দশরথ বসু ইঁহাদের আদি পুরুষ। আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, দশরথ বসু তাঁহাদের অন্যতম। মালাধর বসু দশরথ হইতে ত্রয়োদশ পর্যায়ের।"[১৪]

বংশতালিকাটি হল-- ১ম-- দশরথ, ২য়-- কৃষ্ণ, ৩য়-- ভবনাথ, ৪র্থ-- হংস, ৫ম-- মুক্তি, ৬ষ্ঠ-- দামোদর, ৭ম-- অনন্ত, ৮ম-- গুণাকর, ৯ম-- মাধব, ১০ম-- শ্রীপতি, ১১শ-- যোগেশ্বর, ১২শ-- ভগীরথ, ১৩শ-- গুণরাজ খাঁ। এখানে দেখা যাচ্ছে কুলজীতে মালাধর নামটি নেই। তিনি সর্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' নামে উল্লেখিত হয়েছেন।

আবার কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দেওয়া বংশতালিকাটি একটু ভিন্ন। সেই তালিকাটিও নিম্নে দেওয়া হল— ১ম-- দশরথ বসু, ২য়-- কুশল বসু, ৩য়-- শুভশঙ্কর বসু, ৪র্থ--হংস বসু, ৫ম-- মুক্তিরাম বসু(মাহীনগর), ৬ষ্ঠ-- দামোদর বসু, ৭ম-- অনন্তরাম বসু, ৮ম-- গুণীনায়ক বসু, ৯ম-- মাধব বসু, ১০ম-- শ্রীপতি বসু, ১১শ-- কৃপারাম বসু, ১২শ-- ভগীরথ বসু, ১৩শ-- মালাধর বসু। দুটি তালিকায় পার্থক্য অনেকটাই চোখে পড়লেও সাদৃশ্যের দিক থেকে বলা যায়-- (১) দশরথ বসু দুটি তালিকাতেই বসু বংশের আদি পুরুষ অর্থাৎ দশরথ বসু থেকেই কুলীন গ্রামের বসু বংশের আরম্ভ; (২) মালাধর বসু দশরথ থেকে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ; (৩) এই বংশ মাহীনগর সমাজভুক্ত ছিল। কিন্তু

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই কুলজীর প্রামাণিকতা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে তাই মালাধরের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আবার মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের নাম বলে যান নি। যদি গৌড়েশ্বরের নাম বলে যেতেন তাহলে তাঁর সঠিক সময়কাল নির্ণয়ও সহজ হত। যদিও গ্রন্থের রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক থেকে বলা যায় যে, মালাধরের আবির্ভাবকাল ওই সময়ের থেকে বেশি দূরে নয়। বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'-গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চারজন পদকর্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু গুণরাজ খান এবং মাধবেন্দ্রপুরী।..... মালাধর বসু শ্রীচৈতন্যের জন্মের কিছুদিন পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। তাঁহার উপাধি ছিল গুণরাজ খান্। তাঁহার বংশোদ্ভব সত্যরাজ খান্ ও রামানন্দ বসু প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।"[১৫]

আমরা জানি যে, মালাধরের পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের একজন পার্ষদ ছিলেন। আর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে হয়েছিল। হারাধন দত্তের পুথি অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পাঁচ বছর পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা সমাপ্ত হয়। তাই এই হিসেবে মালাধর বসুর কাল এই সময়ের কাছাকাছি বললে অসঙ্গত হয় না। তবুও কথা হল-- ওই একটি মাত্র পুথির ওপর ভিত্তি করে মালাধর বসুর সময় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

এখন মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের সাধারণ পরিচয় জেনে নেই। বাংলায় প্রথম কৃষ্ণলীলা কাব্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণে লেখা। শ্রীমদ্ভাগবত লিখিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। সাধারণ লোকের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা বোধগম্য না হবার কারণে মালাধর বসু তা সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় লিখতে প্রয়াসী হন। কাব্যমধ্যে তিনি জানিয়েছেন—

> "ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
>
> লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।"[১৬]

আমরা জানি যে, তুর্কী অভিযানের পর পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইংরেজ অধিকারের পূর্বকাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মূলত গীতিমূলক ছিল। অর্থাৎ

বাংলা কাব্য তখনও পর্যন্ত পড়া বা আবৃত্তি করার জন্য শুধু মাত্র লিখিত হত না। মন্দিরা, মৃদঙ্গ সহযোগে একাকী বা দলবদ্ধভাবে কোন মন্দিরে বা পালাগান গাইবার জন্যও রচিত হত। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যও হয়ত এই রকম গান গাইবার জন্যই রচিত হয়েছিল। কাব্যের ভিতরে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখে এই কথা হলফ করেই বলা যায়। মালাধর বসু মূলত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখার কবি রূপেই চিহ্নিত। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মালাধরের প্রসঙ্গ প্রথম আলোচনা করেন। তিনিও অনুবাদ শাখার মধ্যেই কবি মালাধরকে উপস্থাপিত করেছেন—

> "১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন ও সাত বৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাধান করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়',....।"[১৭]

আলোচ্য কাব্যটিকে অনুবাদ শাখার মধ্যে ধরা হলেও মালাধর যে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে ভাগবতকে হুবহু অনুবাদ করেননি সে কথাও তিনি জানিয়েছেন। এই কাব্যে মালাধরের বন্দনা অংশের দুটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সেই পঙ্‌ক্তি দুটি হল—

> "ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে ।
>
> লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে ।।"[১৮]

কবির কথা অনুযায়ী এই পয়ার দুটির অর্থ করলে দাঁড়ায় যে, তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনে লৌকিক ভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এখান থেকেই অনেকের অনুমান মালাধর সংস্কৃত জানতেন না, এবং তিনি মূল ভাগবতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না। তিনি পণ্ডিতের মুখে শুনে এই কাব্য লিখেছেন। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ মালাধরের যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না, এই কাব্য তার বহু সাক্ষ্য বহন করে। তাহলে এখানে প্রশ্ন থাকে, ঐ দুটি পয়ার কবি কেন ব্যবহার করেছেন ? অনুমিত হয়, এই দুটি পঙক্তির অর্থ এই যে, ভাগবত অভিজ্ঞ কোন পণ্ডিতের কাছে ভাগবতের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তিনি লৌকিক ভাবে তার অর্থ লিখেছেন। এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের

মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত টীকা টিপ্পনীর সহিত বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংস্রব না আছে এমন নহে।"[১৯]

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য কয়েকটি নামে পরিচিত। গ্রন্থ মধ্যে কবি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' নাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। যথা--

১) "জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।।"[২০]

২) "জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভূবনে।
'গোবিন্দবিজয়' গুনরাজখাঁন ভনে।।"[২১]

আবার দেখা যায় কাব্যের যে সব অংশে কবি বলরামের কাহিনি বর্ণনা করেছেন সেখানে 'বলের বিজয়' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন—

"বলের বিজয় নর সুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে।।"[২২]

সাধারণত এই ভাবে গ্রন্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করার ফলে গ্রন্থের আসল নাম কি তা নিয়ে একটি সংশয় উপস্থিত হত। কিন্তু কবি মালাধর সে সুযোগ রাখেন নি। কারণ গ্রন্থের বেশিরভাগ জায়গায় 'গোবিন্দবিজয়' নাম ব্যবহার করা হলেও তিনি 'কৃষ্ণবিজয়' নামটিও ব্যবহার করেছেন সমান ভাবে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের এক স্থানে কাব্যের নাম শুধুমাত্র 'কৃষ্ণবিজয়' দেখা যায়। আমরা উক্ত গ্রন্থটি হাতে পাইনি। তাই অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ থেকে উক্ত পংক্তিগুলি তুলে ধরছি—

"শ্রীভাগবত গ্রন্থ ব্যাসদেব কৈল।
গুণরাজ খান তাহা পাঁচালী রচিল।।

কৃষ্ণবিজয় থুইল পাঁচালীর নাম।

সর্ব্বজন-মনোরথ, অতি অনুপাম।।

কৃষ্ণবিজয় পুথি না থাকে সবার ঘরে।

থাকে ঘরে, যা'কে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।।"[২৩]

মনে হয় 'কৃষ্ণ' এবং 'গোবিন্দ' নাম সমার্থক হবার কারণেই কবি দুটি নামই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের অনুমান এই বর্ণনা কবির নিজের নয়। পরবর্তী কালের কোনো লিপিকরের দ্বারা বা কোনো গায়েনের দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তবে এই বিবরণ থেকেও বোঝা যায় যে, কাব্যটি 'কৃষ্ণবিজয়' নামেই পরিচিতি লাভ করেছিল। কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হিসেবে প্রাধান্য পাবার পিছনে অন্য একটি কারণ থাকতে পারে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থানকালে সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুকে উদ্দেশ্য করে এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশংসা করে কাব্যটিকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অভিহিত করেছিলেন। তাই সেই কারণেই বৈষ্ণব সমাজে তা শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

কবি মালাধর বসু ভণিতায় তাঁর কাব্যের নাম কখনো 'গোবিন্দবিজয়' আবার কখনো 'কৃষ্ণবিজয়' বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল ভাগবত নামের প্রসিদ্ধ পুরাণের অনুবাদ হলেও কবি নামকরণে 'ভাগবত' শব্দ ব্যবহার না করে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার করলেন কেন? 'বিজয়' শব্দের আভিধানিক বা আক্ষরিক অর্থই বা কি ? এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য—

> "শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যেদিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।"[২৪]

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'মঙ্গল ও বিজয়' কাব্য বলিয়া দুই স্বতন্ত্র প্রকারের কাব্যধারা বর্তমান ছিল। এই ধারণা নিতান্তই ভুল। একই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে কখনও 'মঙ্গল' কখনও বা 'বিজয়' নাম পাইতেছি। যেমন, মালাধর বসুর কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল এই তিন নামেই সমান ভাবে সুপরিচিত ছিল।"[২৫]

‘প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এই বিষয়ে বলেছেন—

> “কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের ‘বিজয়’ কথাটি কেহ ‘মৃত্যু’ এবং কেহ ‘যাত্রা’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। মালাধর বসু ১০ম-১১শ স্কন্ধদ্বয় মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অসুরবিজয়ী ও ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণের ‘বিজয়যাত্রা’ অর্থে ‘বিজয়’ শব্দটি গ্রহণ করাই বোধ হয় অধিক সঙ্গত। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগরূপ মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের রুচিসম্মতও নহে। সম্ভবতঃ এই জন্যই কবি মালাধর বসু ইচ্ছা করিয়াই ভাগবতের শেষ স্কন্ধ বা ১২শ স্কন্ধের অনুবাদ করেন নাই।”[২৬]

আবার খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁর সম্পাদিত ’শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ গ্রন্থে বলেছেন—“ ‘বিজয়’ শব্দের আভিধানিক অর্থ মৃত্যু কোথায়ও পাওয়া যায় না। বিজয় শব্দের প্রাচীন বা অর্বাচীন ব্যবহারেও মৃত্যু অর্থ দেখি নাই।... দেবীর গমন বা যাত্রা অর্থে বিজয় শব্দ ব্যবহৃত হয় বটে, মৃত্যু অর্থে নিশ্চয়ই নয়। বিজয়া কথাটি ‘বিজয়া দশমী’র সংক্ষেপ।... যেখানে গৌরব করিয়া কাহারও গমন বা যাত্রার বিষয় বলিতে হয়, সেখানে বিজয় শব্দ ব্যবহার করিবার রীতি আছে। ইহা হইতে কাহারও গৌরবময় জীবনযাত্রা বা চরিত বুঝাইতে বিজয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। ..... শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিতাখ্যান বা পরবর্তী কালে যে অর্থে মঙ্গল (মাহাত্ম্য) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই অভিপ্রেত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, কেবল মহাপ্রয়াণ নহে।”[২৭]

পরিশেষে বলা যায়, রামায়ণ অনুবাদ ও ভাগবত অনুবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রামায়ণ অনুবাদ করেও কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রকৃত অভাব দূর হয়নি। রামায়ণ অনুবাদিত হয়ে সাহিত্যিক রসায়ণের বিশোধন হয়েছিল। এই কাব্য বঙ্গীয় জনসাধারণকে ধামালী কাব্যের আদিম রসের পরিবর্তে আর্য সংস্কৃতির মধুর আস্বাদ প্রদান করেছিল। কিন্তু এই অনুবাদে সাহিত্যিক প্রয়োজন মিটলেও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটেনি। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ যে কৃষ্ণকলঙ্ক প্রচার করেছিল তার কলঙ্ক মোচন করার প্রয়োজন ছিল। রামায়ণের দ্বারা সেটি সম্ভব ছিল না। তাই বলা যায়, চৈতন্য পূর্ব যুগে বৈষ্ণব সমাজের মনোবেদনা দূরীভূত হয়েছিল মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লাঞ্ছিত দেব-মহিমা মালাধরের ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে’ আবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনুবাদ গ্রন্থের ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ নামটিকে করে তুলেছে সার্থক।

এবারে আমরা ষোড়শ শতকের ভাগবত অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেব।

সংস্কৃত 'ভাগবত' অনুবাদের ধারায় বাংলার প্রথম প্রতিনিধিরূপে শ্রীচৈতন্য যেমন কবি মালাধর বসুর বন্দনা করেছেন, তেমনি চৈতন্যের সমসাময়িক আর একজন ভাগবতের অনুবাদক তাঁর স্নেহধন্য হয়েছিলেন। তিনি হলেন—'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে ভাগবতের অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুই যেমন একমাত্র, চৈতন্যযুগে কিন্তু রঘুনাথ একমাত্র ভাগবত অনুবাদক নন। তবু তাঁকেই আমরা চৈতন্যযুগে প্রতিনিধিস্থানীয় ভাগবত-অনুবাদক হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। কারণ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর বাংলা অনুবাদে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দশম এবং একাদশ স্কন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য সমসাময়িক কালে যে কবিকে ভাগবতের মোটামুটি সব স্কন্ধের অনুবাদ করতে দেখা যায় তিনি হলেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "এদেশে ভাগবত পুরাণের জনপ্রিয়তা রামায়ণ বা মহাভারতের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় বহু কাব্য লেখা হয়েছে। তার মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রাচীনতম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষায় ভাগবতপুরাণের অনুবাদ খুব বেশী হয়নি। যে ক'খানি অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রঘু পণ্ডিত নামে পরিচিত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের অনুবাদই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগরে। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত আকারে এবং শেষ তিন স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত।"[২৮]

কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয় সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও অল্প কিছু তথ্য তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের যে কোন কবির পরিচয় উদ্‌ঘাটনে আমরা প্রথমেই সেই কবির রচিত কাব্যের ভণিতা, কবির আত্মপরিচয় ও পুষ্পিকা অংশ দেখে থাকি। কারণ কাব্যের এই অংশগুলি থেকেই কবি সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মধ্যে রঘুনাথের আত্মপরিচয়

আমরা তেমন ভাবে কোথাও পাইনি। শুধু পেয়েছি কবির নাম, উপাধি এবং তার গুরুদেবের পরিচয়। কবি কাব্যের ভণিতায় লিখেছেন—

১) "ধীরশিরোমণি শ্রীল-গদাধর জান।
ভাগবত আচার্যের মধুরস-গান।।"[২৯]

২) "কৃষ্ণগুণকর্ম, ভাই, শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে।।"[৩০]

৩) "ভক্তিরস গুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী।।"[৩১]

উপরিউক্ত ভণিতাগুলির মধ্যে প্রথম ভণিতাটিতে দেখা যায় কবি নিজেকে 'ভাগবত আচার্য' বলেছেন এবং গদাধরের নাম করেছেন। দ্বিতীয় ভণিতাটিতে তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' বলেছেন এবং পাশাপাশি শুধুমাত্র 'রঘুনাথ' শব্দটি নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় ভণিতায় তিনি নিজের নাম 'রঘুনাথ পণ্ডিত' বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, কবির নাম রঘুনাথ পণ্ডিত। তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং 'ভাগবতাচার্য্য' কবির উপাধি ছিল। জানা যায় যে, এই উপাধিটি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দেওয়া। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল থেকে পুরীধামে ফিরে আসবার সময় রঘুনাথের বরাহনগরের বাড়িতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমার রঘুনাথ বাল্যকাল থেকেই 'শ্রীমদ্ভাগবত'-গ্রন্থে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং শুদ্ধ ভাগবতগণের কাছে তা অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর 'রামকেলি'-গ্রামে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করে 'শান্তিপুরে' কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে কুমারহট্ট ও পানিহাটী হয়ে বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথের ভবনে পদার্পণ করেন। রঘুনাথ 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রবণ করিয়ে মহাপ্রভুর আতিথ্য সৎকার করেছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও প্রেমাবিষ্ট হয়ে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রেমানন্দে নৃত্য ও শ্রীরঘুনাথের গুণ কীর্ত্তন করে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য্য'-উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায়—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।

সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।
শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়।।
সেহো বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।।
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।
হেন সে করেন প্রভু প্রেমার প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস।।
এই মত রাত্রি তিন প্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণনিধি।।"[৩২]

মহাপ্রভু রঘুনাথের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে বলেছিলেন--

"প্রভু বোলে 'ভাগবত এমন পঢ়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ।।
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য ।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য'।।"[৩৩]

চৈতন্যভাগবতে উল্লেখিত এই 'মহাভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণ' যে রঘুনাথ ব্যতীত আর কেউ নয় তা সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে রয়েছে-- "বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্।"[৩৪] অর্থাৎ ভাগবতাচার্য গৌরাঙ্গের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। আবার কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়

চৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র একজন মাত্র ভাগবতাচার্যেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। রঘুনাথের পদবী দান প্রসঙ্গে নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে একটি তথ্য পাওয়া যায়। তিনি জানিয়েছিলেন যে, বিদ্যানগরের দেবানন্দ নামে এক পণ্ডিত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তদানীন্তন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই দেবানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা ও আচার্য্য বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তবুও শ্রীমহাপ্রভু সেই দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা কুসিদ্ধান্তপর বলে ক্রোধলীলা প্রকাশ করেছিলেন, আর শ্রীরঘুনাথকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য'-উপাধি প্রদান করেছিলেন। এই সময় থেকেই রঘুনাথ বিশ্ববৈষ্ণবসভায় 'শ্রীভাগবতাচার্য্য' নামে সুপরিচিত হন। এই উপাধিটির প্রতি কবির আকর্ষণ বেশি ছিল। আর সেই জন্যই নিজের নামের পরিবর্তে এই উপাধিটিই কবি তাঁর কাব্যে অধিক ব্যবহার করেছেন। এ কথা বলার কারণ হল, রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক যে উপাধি প্রদান করা হল সেই উপাধি যে কবির অত্যন্ত আদরণীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের মাতা পিতার নাম জানা যায় নি, কারণ গ্রন্থের মধ্যে কোথাও তিনি তা উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি যে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন সেই কথা গ্রন্থের মধ্যে একাধিক বার তাঁকে বলতে দেখা যায়। রঘুনাথ বলেছেন যে, তাঁর গুরুদেবের নাম গদাধর পণ্ডিত। এই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। কৃপা বশত 'অশেষ পাতকী জীব' উদ্ধার করার জন্যই তিনি 'ক্ষিতিতলে' অর্থাৎ পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে--

"পণ্ডিত গোসাঞী শ্রীল গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে।।
ক্ষিতিতলে কৃপায়ে করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার।।
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ, চৈতন্য মুরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব, সহজে শকতি।।
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।

দেহ-মন-বাক্যে মোর সেই সে শরণ।।”[৩৫]

নিমাই পণ্ডিতের মহাপ্রভু হিসেবে প্রকাশিত হবার আগে ও পরে যে সমস্ত ব্যক্তি বর্গ মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন সেই হিসেব ধরে অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর ‘ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য’-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পরিকর বৃন্দকে চারটি বর্গে বিভক্ত করেছিলেন। এই চারটি বর্গের মধ্যে আমরা তৃতীয় বর্গে রঘুনাথের নাম দেখতে পেয়েছি। তিনি কবি রঘুনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> “ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিমাই পণ্ডিতের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একটি বর্গে স্থাপন করা যায়। ইহাঁরা প্রভুর নবদ্বীপলীলার সহচর। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, গৌরীদাস, মুকুন্দ দত্ত, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন, যদুনাথ, কবিচন্দ্র, বলরাম দাস ও শঙ্কর ঘোষ এই পনের জন কবি এই বর্গের অন্তর্গত। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহাঁদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, কানাই খুঁটিয়া, অনন্ত আচার্য্য, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র ও কানুরাম দাস এই আটজন কবি।”[৩৬]

উপরিউক্ত এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার পনের জন কবির মধ্যে রঘুনাথ ছিলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। আর সেই সময়কাল আনুমানিক ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য সম্পর্কে তিনি আরও জানিয়েছেন—

> “তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোন পদ রচনা করেন নাই। তবে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে এমন অনেক অংশ আছে যাহা গান করিবার উপযুক্ত। আমরা গোষ্ঠলীলা এবং রাসলীলায় তাঁহার কয়েকটি পদ দিলাম।.....পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানদাসের মাত্র দুইটি পদ শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতের আধারের উপর লিখিত। ঐ পদ দুইটির আস্বাদন যাহাতে পাঠকগণ সম্যকরূপে করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য কৃত ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে দিব্যোন্মাদের ছয়টি পদ দিলাম। এই পদকয়টি কতটা গীতধর্ম্মী তাহা বলা কঠিন।”[৩৭]

আমরা অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ১৩৬৭ সালে অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' গ্রন্থেই প্রথম ভাগবতাচার্য কৃত দুটি পদ জায়গা পেয়েছিল। সেই পদ দুটি হল— 'কঙ্কণ-কিঙ্কিণী নূপুরের ঝনঝনি' এবং 'সকৃৎ অধরমধু করাইয়া পান'। এই পদ দুটি ভাগবতেরই অনুবাদ এবং তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থ থেকে আহৃত। প্রথম পদটি রাসলীলা বিষয়ক এবং অন্যটি হল দিব্যোন্মাদ এর। পরবর্তী কালে ১৩৬৮ সালে অর্থাৎ ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত, বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য' পদাবলী সংকলনে এই পদ দুটির সঙ্গে আরও কয়েকটি পদ সংকলিত হয়েছে। এর আগের কোন প্রাচীন বাংলা পদাবলী সংকলনে ভাগবতাচার্যের পদ সংকলিত হয় নি। এমন কী বৈষ্ণব দাস সংকলিত, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' সংকলনে ব্যাসদেব রচিত 'শ্রীমদ্ভাগবতম' গ্রন্থ থেকে তিনটি শ্লোক (শ্লোক সংখ্যা ১২৬৭, ১৬৩০ ও ১৬৩১) পদ হিসবে গৃহিত হলেও ভাগবতাচার্যের কোন পদ সেখানে পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসা অবান্তর নয় যে, এর কারণ কি ? আমাদের অনুমান এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী সম্পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের ওপর আধারিত। আর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য কৃত গ্রন্থ শুধুমাত্র ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে গোপীগণের উল্লেখ থাকলেও শ্রীরাধার উপস্থিতি প্রাধান্য পায়নি। আর সেই কারণেই ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থেও রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় নি। তাই রঘুনাথ রচিত কোন পদ পদাবলী সংকলনেও জায়গা পায়নি।

ভাগবত অনুবাদক কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ'-গ্রন্থে কবি রঘুনাথের কথা জানিয়েছেন—

> "...মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভক্তিভাবুকতা প্রসারের সহায়ক হয়েছিল।.... ভাগবতের অপর বিখ্যাত অনুবাদক হলেন মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ আচার্য। বৃন্দাবনপথে ভক্তসঙ্গে মিলন-বাসনায় মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণের পর যখন গৌড়ে এসেছিলেন তখন প্রত্যাবর্তনের পথে বরাহনগরে রঘুনাথ আচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর ভাগবতব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভাগবতাচার্য আখ্যা দেন।"[৩৮]

এখানে লক্ষ্যনীয় যে তিনি রঘুনাথ আচার্যকে মহাপ্রভুর 'বয়োজেষ্ঠ্য' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মাইতি আবার তাঁর 'চৈতন্য পরিকর' গ্রন্থে রঘুনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"চৈতন্যচরিতামৃতের মূল-স্কন্ধ-শাখা এবং অদ্বৈত ও গদাধর-শাখায় একজন করিয়া মোট তিনজন ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মূল-শাখার ভাগবতাচার্য সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বর্ণিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডল হইতে দ্বিতীয়বার নীলাচল গমন-পথে বরাহনগরে 'মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে' গিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠে 'সুশিক্ষিত' ছিলেন এবং তাঁহার ভাগবত-পাঠে মহাপ্রভু এতই মুগ্ধ হন যে তাঁহার পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে 'বাহ্য পাশরিয়া' নৃত্য আরম্ভ করেন।"[৩৯]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তগণের বর্ণনায় ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। সেখানে তাঁর নাম যেভাবে আছে—

"রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস।।"[৪০]

এই গ্রন্থের আদিলীলা ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখা বর্ণনেও একজন ভাগবতাচার্য রয়েছেন—

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা।।
বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।।
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য।।"[৪১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ গদাধর শাখা বর্ণনা সূত্রেও ভাগবতাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন—

"শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন।।

শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী।

ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী।।"[৪২]

আমরা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ ঘেঁটে তিনজন ভাগবতাচার্যের উল্লেখই পেয়েছি। একজন শ্রীচৈতন্যের শাখাভুক্ত, দ্বিতীয়জন অদ্বৈতাচার্যের শাখাভুক্ত এবং তৃতীয়জন চৈতন্য পরিকর গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। আমাদের অনুমান শেষোক্ত ব্যক্তি এবং শ্রীচৈতন্যের শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্য একই ব্যক্তি। 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি কোন ভাগবতাচার্যের রচিত তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। এই প্রসঙ্গে 'চৈতন্য পরিকর' গ্রন্থ থেকেই জানা যায়— "১৩৪৪ সালে হরিদাস ঘোষাল মহাশয় তাঁহার 'শ্রীভাগবত আচার্যের লীলা প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধগুলিতে জানাইয়াছেন যে, গ্রন্থখানি বরাহনগরের রঘুনাথ আচার্য কর্তৃকই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু হরিদাসবাবু তাঁহার উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। অপর পক্ষে রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় 'ভাগবতাচার্য-প্রণীত বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবতের হস্তলিখিত পুথি' একখানি প্রাপ্ত হইয়া ১৩০৬ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, 'চৈতন্যচরিতামৃতের' চৈতন্য-শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্য 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী'র রচয়িতা নহেন, উক্ত গ্রন্থের গদাধর-শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্যই আলোচ্যমান গ্রন্থের রচয়িতা। প্রবন্ধকার যে-সকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য গদাধরকেই নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।"[৪৩]

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় আবার রঘুনাথের জন্মেতিহাস ঘেঁটে তাঁর ওপর ভগবানের সত্তা আরোপ করে নিজের 'শ্রীসজ্জন্তোষণী' পত্রিকার ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যায় জানিয়েছিলেন— "কৃষ্ণগণ ও গৌরগণ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার 'শ্যাম-মঞ্জুরী' নামা সখী শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীশ্যামমঞ্জুরী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কৃষ্ণগান অর্থাৎ শ্যামলীলা শ্রবণ করাইতেন। তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীভাগবতাচার্য্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়া নিজ-সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধা তাঁহাকে ঐ সেবা দান করেন। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী তাঁহাকে স্বীয় শাখায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের যথাযোগ্য সেবা দান করিয়াছিলেন। সেবার লক্ষণ এই যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে 'বরাহনগরে' তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন পাদ্য-জলাদি দান-সেবা অবলম্বন না করিয়া শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বীয়

সিদ্ধ সেবা যে শ্রীভাগবত-পাঠ তাহাই করিতে লাগিলেন। সখীদিগের শ্রীরাধাদত্ত সেবাই কর্ত্তব্য, ইহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল।"[৪৪]

প্রাক্-চৈতন্য যুগে ভাগবতের একমাত্র অনুবাদক হিসেবে আমরা যেমন মালাধর বসুকে পেয়েছি, তেমনি চৈতন্য যুগে ভাগবতের অনুবাদক হিসেবে অনেকের কৃতিত্ব থাকলেও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য অগ্রগণ্য। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, অন্য কোনো নাম পাওয়া যায় নি। যথা—

"ভাষায় রচিব 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'।
শুনিলে গোবিন্দ-প্রেম হয়, হেন জানি।।[৪৫]

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্যের নাম যে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' তা কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' থেকেও জানা যায়। কবি বলেছেন—

"নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।।"[৪৬]

আবার যদুনন্দন দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে রয়েছে—

"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।।"[৪৭]

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের রচনা কোন সময়ে হয়েছিল এই বিষয়ে গ্রন্থে কবি রচনাকাল সংক্রান্ত কোন নিদর্শন রেখে যান নি। এমনকি, তিনি কোনো রাজা বা জমিদারের নামও তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেন নি। যদি করতেন তাহলে এই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় সহজ হত। এই প্রসঙ্গে বিমান বিহারী মজুমদারের মন্তব্য— "শ্রীচৈতন্যের বা তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যের নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়া যাঁহারা পদ রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহ দেশের সুলতান বাদশাহ বা রাজরাজড়ার চাটুকারিতা করেন নাই।"[৪৮] এই কথা অনেকটাই সত্য। কারণ বৈষ্ণব কবিগণ দীনতার খনি।

আমরা ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali language and literature' গ্রন্থ থেকে একটি ছবি পেয়েছি। সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া

যাচ্ছে, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য ভগবতগীতা শুনছেন। অনুমান করা হয় ছবিটি আঁকা হয় ১৫১২-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের সময়কালে পুরী বা নীলাচলের রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশে। এই ছবিটিতে মধ্যমণি হিসেবে দেখা যাচ্ছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে। তাঁর ডানদিকে রয়েছেন প্রভু নিত্যানন্দ। এছাড়া রয়েছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য এবং এই ছবির আদেশকর্তা রাজা প্রতাপরুদ্র দেবকে দেখা যাচ্ছে সাষ্টাঙ্গে প্রণামরত। রাজার সামনে একটি ময়ূর দেখা যাচ্ছে। কোথাও এই ছবির শিল্পীর উল্লেখ নেই। ছবিটি শ্রীনিবাস আচার্য নদীয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। জানা যায় যে, শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরদের মাধ্যমে ছবিটি মহারাজ নন্দকুমারের হাতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার কুঞ্জঘাটায় রক্ষিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির জানা তাঁর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থে প্রতাপরুদ্র দেব এবং শ্রীচৈতন্যের ছবি নিয়ে লিখেছেন—

> "সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র' পুস্তকে লিখেছেন : কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তীরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যারত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু ও সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত শ্রীপ্রতাপরুদ্রের একটি আলেখ্য তাঁহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ আলেখ্যরই একটি প্রতিলিপি মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে।"[৪৯]

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Archeological Survey of Mayurbhanja' গ্রন্থের 'Pratappur' অধ্যায়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

> "Prataprudra had ordered a likeness of Chaitanya to be painted in water colours, in which the king himself is represented as lying prostrate before his great religious master. The painting which is a rare specimen of art is still preserved at Kunjaghata Rajbari, Murshidabad."[৫০]

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে রাজা প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল তার প্রমাণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ থেকেই লাভ করা যায়। আমরা 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ' গ্রন্থ থেকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সেই অংশটুকু তুলে ধরছি—

"যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।

তাহারে মলিন করে এক রাজা নাম।।"[৫১]

যুধিষ্ঠির জানা ওরফে মালিবুড়ো ১৯৫৮ খ্রিষ্ঠাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থের শেষে 'সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' অধ্যায়ে প্রতাপরুদ্র দেব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই অংশ থেকেই জানা যায়— রাজা প্রতাপরুদ্র দেব ছিলেন নীলাচল বা পুরীর গজপতি বংশের রাজা। তাঁর পিতার নাম পুরুষোত্তম দেব এবং মাতার নাম রূপাম্বিকা। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরষোত্তম দেব ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপরে প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহন করে ঐতিহাসিকগণের মতে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে নিহত হন। তাঁর রাজ্যের সীমানা ছিল বঙ্গের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে শুরু করে মাদ্রাজ এর গুন্টুর জেলা পর্যন্ত এবং তেলেঙ্গানার অধিকাংশ তাঁর অধীনে ছিল। প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ছিল মহানদীর তীরবর্তী কটক নগর। অর্থাৎ প্রতাপ্রুদ্রের রাজত্বকাল তাহলে দাঁড়ায় ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থের রচনা কোন সময়ে হয়েছিল সেই বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "গ্রন্থের মধ্যে নমস্ক্রিয়ায় বা ভণিতায় কোথাও রূপ, সনাতন বা রঘুনাথ দাসের নাম নাই, কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর (পরবর্তীকালে যাঁহা দিগকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে) এবং হরিদাসের নাম আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জীবন কালে বা তাঁহার তিরোধানের অত্যল্পকাল মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়।"[৫২]

সুকুমার সেন তাঁর 'History of Brajabuli Literature' গ্রন্থে ভাগবতাচার্যের সময়কাল ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই জানিয়েছেন। তিনি এই কবি সম্বন্ধে গ্রন্থের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

> "In the Bangabasi edition of Krisna-prema tarangini there is a mixed Brajabuli poem. The corresponding portion of the VSP edition of the same work is an entirely different poem, a Bengali poem in tripodi metre. Raghunatha Bhagavatacarya was a follower of chaitanyadeva. He was a disciple of Gadadhara pandita, and lived at Barahanagara (modern Baranagore, a northern suburb of calcutta). On his way back to Nilacala from Kanai-natasala the great master stopped for a night at the house of Raghunatha. He was so pleased with Raghunatha's recital of the Bhagavata-purana that he

conferred on him the tittle 'Bhagavatacarya'. Kavi- Karnapura in his Goura-ganoddesa-dipika (completed in saka 1498=1577 A.C.) mentions the Krisna-prema-tarangini. So the work must have been completed some time before that date."[৫৩]

তথাপি বলা যায় যে, এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীতেই হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী বলার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বরাহনগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর ভাগবত পাঠ শুনে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এই কথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই ঘটনার সময়কাল আনুমানিক ১৫১৪-১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দ। 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখিত ব্রাহ্মণ, যাঁকে চৈতন্যদেব ভাগবতাচার্য উপাধি দিয়েছিলেন তিনি যে রঘুনাথ পণ্ডিত তা আগেই বলা হয়েছে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং তিনি চৈতন্যদেবের কাছেই সুললিত কণ্ঠে ভাগবত পাঠ করে মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করেছিলেন। আমাদের মতে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ তিনি তখনও করেন নি, করলে চৈতন্যভাগবতে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি ভাগবত নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন এবং শুধু ভাগবত পাঠে সন্তুষ্ট না থেকে লৌকিক ভাষায় ভাগবত অনুবাদও করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বিরচিত কবি কর্ণপুরের 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় যে এই কাব্যটি ষোড়শ শতকেই রচিত।

তৃতীয়ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী 'রঘুনাথ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক ভক্ত'। চৈতন্যের সময়কাল ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ হলে সেই সময়ে রঘুনাথ নিতান্তই বালক। চৈতন্যের দেখা পাবার পরেই তিনি ভাগবত অনুবাদে অগ্রসর হন।

আমরা জানি, শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত দুরূহ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য না থাকলে এর যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নয়। রঘুনাথ অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তাই তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ হয়ে, বৈষ্ণব সমাজের কাছে যেমন পরম আদরের বস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে, পাশাপাশি তেমনি সাধারণ পাঠক সমাজেও তা স্বীকৃতি পেয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'(প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ- ১৯৫৯, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা - ৪৭৩।

২. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ১১।

৩. ঐ, ভূমিকা, কবির পরিচয়, পৃষ্ঠা - i।

৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৬৩।

৫. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, ভূমিকা, কবির পরিচয়, পৃষ্ঠা - i।

৬. ঐ, ভূমিকা, কবির পরিচয়, পৃষ্ঠা - ii।

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ১৭২।

৮. ভট্টাচার্য, তারাপদ : 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস', প্রাচীন পর্ব, এস গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৮-কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ- আগষ্ট ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ১০৩-১০৪।

৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ

১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৬৪।

১০. রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত) : 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত, মধ্যলীলা : প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৬১৭-৬১৮।

১১. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ১৭২।

১২. রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত) : 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত, মধ্যলীলা : প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা -৫৩৩।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬০৭।

১৪. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, ভূমিকা, কবির পরিচয়, পৃষ্ঠা - vi।

১৫. মজুমদার, বিমান বিহারী : 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'(১৪১০-১৯১০), জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, ১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা - ৩৩।

১৬. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩।

১৭. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ১৭২।

১৮. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩।

১৯. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ১৭৩।

২০. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ১১।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৬।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১২।

২৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৬৮।

২৪. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ১৭৩।

২৫. সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৩৯, পৃষ্ঠা - ৭।

২৬. দাশগুপ্ত, ড. তমোনাশ চন্দ্র : 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯, পৃষ্ঠা - ৩৮১।

২৭. মিত্র, শ্রী খগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, ভূমিকা- পৃষ্ঠা - xi।

২৮. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', জি, ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ২১-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭৫।

২৯. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ২।

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৫।

৩২. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) : 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', অন্ত্যখণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন, ১৩৭৩, শকাব্দা ১৮৮৮, ফেব্রুয়ারী-১৯৬৭, নবকলেবর রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃষ্ঠা - ১৯৮।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯৮।

৩৪. বিদ্যাসাগর, নন্দলাল (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ময়মনসিংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ; ৩০ শে কার্ত্তিক, প্রকাশ-১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।

৩৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ২।

৩৬. মজুমদার, বিমান বিহারী : 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য', জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, ১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৩৬৮, জুন ১৯৬১, পৃষ্ঠা - ৫।

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ৭০।

৩৮. দাস, ক্ষুদিরাম : 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ', বইপত্র, ৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা ১৩৬৬, পৃষ্ঠা - ২২।

৩৯. মাইতি, রবীন্দ্রনাথ : 'চৈতন্য পরিকর'(ষোড়শ শতক), বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬, প্রকাশকাল ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৩৫৬।

৪০. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) : 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৬২৭।

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৪৬।

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৪৮।

৪৩. মাইতি, রবীন্দ্রনাথ : 'চৈতন্য পরিকর'(ষোড়শ শতক), বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-ছয়, প্রকাশকাল ১৯৬২। পৃষ্ঠা - ৩৫৬।

৪৪. বিদ্যাসাগর, নন্দলাল (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ময়মনসিংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ; ৩০ শে কার্ত্তিক, প্রকাশ-১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।

৪৫. পরমহংস, বিষ্ণুপাদ ভাগবত মহারাজ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল- ১২ই চৈত্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ২৬ শে মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, প্রথম স্কন্ধ, পৃষ্ঠা - ২।

৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।

৪৭. বিদ্যাসাগর, নন্দলাল (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ময়মনসিংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ; ৩০ শে কার্ত্তিক, প্রকাশ-১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।

৪৮. মজুমদার, বিমান বিহারী : 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য', জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, ১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ-আষাঢ় ১৩৬৮, জুন ১৯৬১, পৃষ্ঠা - ৫।

৪৯. জানা, যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো) : 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য'(১ম ও ২য় খণ্ড), ময়না প্রকাশনী, ১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- শুভ রথযাত্রা, ২০ জুন, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা - ৩০৬-৩০৭।

৫০. Vasu, Nagendranath : 'The Archeological Survey of Mayurbhanja,' VOL.I, Published by The Mayurbhanja State

৫১. দাস, ক্ষুদিরাম : 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ', বইপত্র, ৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা ১৩৬৬, পৃষ্ঠা - ১৬।

৫২. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ভূমিকা xxiv।

৫৩. Sen, Sukumar : 'A History Of Brajabuli Literature', Published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Senath House, calutta, August 1935-E. পৃষ্ঠা - ৪৬৭।